পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার সংকট

জীবনের এই পড়ন্ত বিকেলে এসে একটা বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পেরেছি। একটা জীবন আসলে অগণিত জীবনপথের অবিরাম ও অনিবার ক্রসিং, ঠিক আঁকাবাঁকা হয়ে বয়ে চলা সুদূরের রাস্তার মতো। যেখান থেকে জন্ম নেয় অভিজ্ঞতা। সত্তর দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে ভর্তি হয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটা চিরচেনা হয়ে আছে। বিগত ২ জুলাই ২০২৩ ঈদের খুশি ম্লান হবার আগেই যুগান্তর পত্রিকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে পড়তে হলো 'ইউজিসির অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা নিয়ে কিছু প্রশ্ন' শিরোনাম। সেখানে পুরো আর্থিক নীতিমালা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি, তবে তরুণ প্রাবন্ধিকের লেখার মধ্যে কিছু বিষয় উল্লেখ থাকাতে বিষয়টা আঁচ করতে পেরেছি। সে বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। প্রাবন্ধিক হয়তো মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মাস শেষে বেতনের কম টাকা গুণতে গিয়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতিতে বাস্তবতার সাথে খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তাই মনের এ অভিব্যক্তি। তিনি কম অভিজ্ঞতার কারণে জানেন না যে, এদেশে লেখালেখির মাধ্যমে শিক্ষকদের দুর্দশা ও পেশাগত উন্নয়নে কথা শোনার যেন কেউ নেই, বোঝারও কেউ নেই। নেই শিক্ষার মান বাড়ানোর কার্যকরী কোনো ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলছি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন রাজনীতির উন্মুক্ত মাঠ। প্রতিটা দলই এখন এ মাঠ দখলে নিতে মশগুল। দেশব্যাপী পুরোটাই আছে রাজনৈতিক দল আর শিক্ষাঙ্গন নিয়ে 'দলবাজি'। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এটাই হাল-হকিকত। এটা বুঝতে পেরে অনেক গুণি জ্যেষ্ঠ শিক্ষক হয়তো নীরব ভূমিকা পালন করেন। পরিবেশ যতটুকু অনুমতি দেয় নীরবে কায়ক্লেশে নিজের দায়িত্ব সাধ্যমতো পালন করে যান। আমার অফিসে এইট পাস একজন গাড়িচালক মাসে পঁচিশ হাজার টাকা বেতন তোলেন, আর একজন সেরা ছাত্র/ছাত্রী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন মাসে সর্বসাকুল্যে ত্রিশ হাজার টাকা বেতনে। এতে তাদের মধ্যে হতাশা থাকারই কথা। যে হতাশার কথা আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে জীবনভর শুনছি।

পরের দিন যুগান্তর পত্রিকায় আবার পড়লাম, 'র‍্যাংকিং: গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধিতে নজর দিন'। এটাও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে লেখা। গবেষণার বরাদ্দ বাড়লেই র‍্যাংকিং শনৈঃশনৈঃ উন্নতি হবে, শিক্ষার মান আকাশ ছুঁয়ে যাবে– আমি এত সহজ সমীকরণে আস্থা আনতে পারি না। শিক্ষকদের সার্বিক এই বঞ্চনার কথা মনে হলেই আমার কিন্তু একটা গানের কথা মনে হয়, 'শিকল ছিঁড়িতে না পারে, খাঁচা ভাঙিতে না পারে, পাখি ছটফটাইয়া মরে, পাখি ধড়ফড়াইয়া মরে, মনরা পাখি আমার, মনরা পাখি...'।

জানিনে গানটা কে কীভাবে নেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাঁচার গণ্ডিতে শুধু একদল মেধাবী পুরোনো ছাত্রছাত্রী, যারা বর্তমানে শিক্ষক, ধড়ফড়াইয়া মরছে না, এদেশের মেধাবি ছাত্রসমাজও ছটফটাইয়া মরছে। শিক্ষকরা মেধাবি ছাত্র হওয়াতে যে কোনো পেশায় হয়তো জীবন গড়তে পারতেন। শিক্ষকতা শুধু একটা পেশার নাম নয়, একটা ব্রত। শিক্ষার আদর্শে জীবন কাটিয়ে দেবার ইচ্ছায় জীবনের বেশ কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে এসে এখন পিছু ফিরে অনেকেই পস্তাচ্ছেন। পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাকে পস্তাতে বাধ্য করছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ এদেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের একটা বৃহৎ অংশ, এটা তো কারো অস্বীকার করার জো নেই। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে সেখানে ক্রমশ শিক্ষা ও পরিবেশের মান নামতে নামতে বর্তমানে বঞ্চনার গ্লানি এবং সময় শেষে একটা সার্টিফিকেট ছাড়া শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ সেখানে নেই। আমাদের মতো ভূক্তভোগী শিক্ষকরা ছাড়া সেখানকার বর্তমান অবস্থা আর কে জানে! আমি অনেক ছাত্রছাত্রীর সাথে কথা বলেছি। শুধু টিউশন ফি কম ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নামের মোহে পড়ে অনেকেই সেখানে ভর্তি হয়। তবে ছাত্র নামধারী যারা রাজনৈতিক দলের বরপুত্র হয়ে অকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ থেকে বা পরিপার্শ্ব থেকে দলীয় ছত্রছায়ায় আদায়কৃত চাঁদা ও জীবনের রসদ, গাড়ি-বাড়ি, পদ সংগ্রহে ব্যস্ত, কিরিচের ধার পরীক্ষায় মত্ত– তাদের কথা আলাদা। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সেখান থেকে সরকারি টাকায় তাদের ভবিষ্যৎ লাঠিয়াল বাহিনী, দেশ-শোষক ও পেশিশক্তি-সমৃদ্ধ যোগ্য (?) উত্তরাধিকার তৈরি করে নিচ্ছে। এ ছাত্রগুলোও কিন্তু মেধার ধার দেখিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। পরে উদ্বায়ু

হাতের ইশারা ও রঙিন ভবিষ্যতের নেশায় পথ ভুলে বিপথগামী হয়। শুরু হয় পচনধরা-দিকভ্রান্ত রাজনৈতিক দলের তল্পিদারি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও রাজনীতির নামে স্লোগান দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য। কখনো কদাচিৎ বিচারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিচারকের রায় শুনে ফাঁসির মঞ্চের বিভীষিকাময় অবস্থা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় (বুয়েটে আবরার হত্যাকারীদের যেভাবে দেখেছি)। যাদের প্রশিক্ষণে এরা হত্যাকর্মে লিপ্ত হয়, যারা এদেরকে হত্যাকারী বানায়, তারা বহাল তবিয়তে থাকে। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে মেধাবী ছাত্র, বাপ-মায়ের ভবিষ্যৎ স্বপ্নপূরণের ভরসা হয়ে; বের হয় সন্ত্রাসী, অস্ত্রবাজ, পেশিশক্তির আধার নাম নিয়ে। সময়ের অনিবার স্রোতে একসময় হারিয়ে যায়। আমার কথা বিশ্বাস না হলে, পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলো ঘেটে দেখা যায়, কিংবা রাজনৈতিক বিবেচনায় যেসব বড় পদে শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাদের সাথে কথা বলা যায়। বুয়েটের আবরার হত্যাকাণ্ডের পর থেকে ভেবেছিলাম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মনে হয় ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে, যদিও তা হয়নি। বন্ধ হলে শিক্ষাঙ্গন নিয়ে রাজনীতিই পুরোটা বন্ধ হতে হবে, শুধু ছাত্র রাজনীতি কি দোষ করলো! স্বাধীনতার পর থেকে এটাই এদেশের শিক্ষা নিয়ে রাজনীতির অনিবার পরিণতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যতবারই বলি, 'এইডসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এইডসে আক্রান্ত দম্পতির সন্তান জন্ম দিতে ডাক্তার নিষেধ করেছেন।' কে শোনে কার কথা! 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই। মন হরণ চপল চরণ সোনার হরিণ চাই।'

শুধু ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পঙ্কিল রাজনীতিই-বা বলি কেন, পত্রিকায় মাঝেমধ্যেই আসে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ-বাণিজ্যের কথা, সাদা-লাল-নীল-সবুজের সমারোহ, কর্ম ও শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি– মোটকথা শিক্ষাঙ্গনের পুরো ব্যবস্থা নিয়ে রাজনীতি (?)। যখন যে রাজনৈতিক সরকার আসে, শিক্ষা ও পরিবেশের একই অবস্থা। শিক্ষা উগ্র দলাদলিতে রূপ নিয়েছে। বলা যায়, অবস্থা ক্রমশ খারাপই হচ্ছে। যে লঙ্কায় যায়, সেই রাবণ হয়। শিক্ষাঙ্গনের মুক্তি আর মেলে না। আবার দিনে দিনে অনেক শিক্ষক ও পদাশ্রিত বড় পদধারী শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষাপ্রীতি ভুলে রাজনীতিপ্রীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। রাজনীতির দলে শামিল হয়ে কে কোন বড় পদে যাবেন, চলছে তার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় আবার ধাক্কাধাক্কি আছে। শিক্ষাগুরুর মূল শিক্ষা সেখানে উপেক্ষিত। যারা বড় পদে আসীন, তারা যে যোগ্যতাসম্পন্ন নন, তা আমি বলছিনে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা, গবেষণা ও শিক্ষাপ্রশাসনের উন্নতি নিয়ে যাদের কাজ করার কথা, তারা কর্মউদাসী; প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির দলাদলি, নিজের রাজনৈতিক জীবন সামলাতেই মহাব্যস্ত। আমি বড় পদে অধিষ্ঠিত অনেক যোগ্য শিক্ষককে চিনি। তাদের পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক চাপ, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কোন্দল, বিবদমান স্বার্থান্বেষী গ্রুপ সামলাতেই গলদঘর্ম হতে হয়। রুটিন-ওয়ার্ক নিয়েই ব্যস্ত। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে কাজ করার সময় কোথায়! আমি বলছিনে যে, শিক্ষকরা উচ্চপদে যেতে পারবেন না, কিন্তু রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি ও চাটুকারিতা করে কেন? যাবেন শিক্ষাপ্রশাসন ও শিক্ষার পাণ্ডিত্য নিয়ে, উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে, ব্যক্তিত্ব নিয়ে, ক্ষুরধার নৈতিকতা নিয়ে, জ্ঞানের সারথি হয়ে, জাতির শিক্ষা-দিশারি হয়ে।

এদেশের মহামহিম রাজনীতিকরা সর্বসাধারণের সামনে পদাধিষ্ঠিত শিক্ষকদের বলেন, 'এই যে শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরুর দল! আপনাদেরকে আমাদের গৃহপালিত কিছু অকালপক্ক কুঁজো জীব দিলাম। এরা আমাদের কথামতো চলবে। কেমন পারেন এদের চিৎ করে শোয়ান তো দেখি! এরা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের যত অঘটনঘটনপটীয়সী হবে। আপনাদের মুরোদ কতটুকু আমরা দেখতে চাই, আপনাদেরকে অনেক ট্যাক্টফুল (?) হতে হবে।' পরক্ষণেই রাজনীতিকরা পদাধিষ্ঠিত শিক্ষকদের কানে কানে বলেন, "আর শুনুন, আপনাদের কিন্তু নিয়োগ দিয়েছি আমাদের গৃহপালিত এ জীবগুলোকে খাইয়ে-পরিয়ে দেখভাল করার জন্য। এটা আপনাদেরই দায়িত্ব। তাদের স্বার্থের একটু রাইরে গেলেই আমাদের বাইরে যাওয়া হবে। তারা তখন আপনাদের বিরুদ্ধে স্লোগান হাঁকবে। আমরা তখন আর আপনাদের থাকবো না। তখন আপনাদের গদি নড়ে যাবে। সময় থাকতে সাধু সাবধান। 'মোল্লার খাওয়ালে মুর্দায় পাবে'।" 'তোমারে বধিবে যে, গোকূলে বাড়িছে সে।'

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। আমার একসময়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। এদেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের বড় নেতা। আদর্শ ও নীতিতেও ছিলেন অনেক বড় মাপের মানুষ। আমাকে বলতেন, 'নেতা হতে গেলে দলের যে কেউ

যত অন্যায় কাজই করুক না কেন, দলের স্বার্থে তাকে সমর্থন দিয়ে যেতে হয়। এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না! অন্যায়কে ন্যায় বলি কীভাবে!' তিনি বাধ্য হয়ে নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। নেতৃত্ব ধরে রাখতে না পারলে বড় পদে যাবার পথও রুদ্ধ। এই তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ। ভালো নীতিবান শিক্ষক অসংখ্য আছেন, পরিবেশ তাদের দলকানা হতে বাধ্য করছে। এ থেকে কি আমরা তাদেরকে মুক্তি দিতে পারি না?

প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত শিক্ষাগুরু আছেন, পরিকল্পনা মোতাবেক তাদের কাজ করতে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সুশিক্ষা ছড়িয়ে পড়তো। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসহ সামাজিক শিক্ষা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেত। মোটের উপর দেশ উপকৃত হতো। অথচ শিক্ষাঙ্গন দলবাজ, দুর্নীতিবাজ, দুষ্কৃতকারীদের খপ্পরে পড়ে উৎসন্নে যাচ্ছে। শিক্ষার আদর্শে গড়া নীতিবান শিক্ষকরা অসহায় হয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'তে পরিণত হয়েছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে আমরা যতই আত্মজাহির করিনা কেন, এদেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি, শিক্ষা আমাদের উন্নয়নের সহায়ক নয়। আমাদের অনুন্নতি, অব্যবস্থাপনার মূলে আছে মানসিক দেউলিয়াপনা ও বিকৃত চিন্তা-চেতনা। কোনো না কোনো গোষ্ঠীস্বার্থের পাপে পুরো দেশ পুড়ছে। বারবার বলতে ইচ্ছে করে, মুক্তিযুদ্ধ তো শেষ হয়েছে সে-ই বায়ান্ন বছর আগে; যুদ্ধ শেষ হলো, কিন্তু মুক্তি মিললো কই!

আমি চাষ কাজে দেখেছি। ধান আমাদের জীবন রক্ষাকারী ফসল। জমিতে ধানের চারা জন্মানোর সাথে সাথে আগাছা-জঞ্জালে ভরে যায়। জঞ্জাল ধানের কচি চারাগুলোকে একেবারে শীর্ণকায় করে ফেলে। এসময় সার দিলে ধানগাছের তুলনায় আগাছাই বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অধিক পরিমাণে ধান ফলাতে গেলে আগে ধানগাছগুলোকে আগাছা ও জঞ্জালমুক্ত করতে হয়। তারপর সার প্রয়োগ করলে ধানগাছ তরতর করে অল্প সময়ে বেড়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম। সরকারি কোষাগার থেকে তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। অথচ তাদের সক্ষমতা ও সামর্থকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছি না। হয়তোবা বড় জোর চল্লিশ ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিটা পুরোনো জেলায় কমপক্ষে একটা করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এর নিজস্ব জেলার প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষার আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করা সম্ভব। শিক্ষকদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' অবস্থা। আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগাছা ও জঞ্জালমুক্ত করতে হবে। তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার মতো উচ্চতর আলাদা স্কেলে বেতন দিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে সকল অরাজকতা, দলবাজি, রাজনীতি থেকে আলাদা করতে হবে। নীতিবান, জ্ঞানপিপাসু শিক্ষাবিদদের শিক্ষাঙ্গন চালানোর দায়িত্বভার দিতে হবে। শিক্ষকদের তিনটি কাজের দায়িত্ব দিতে হবে: ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত শিক্ষাপ্রদান ও মেন্টর হিসেবে কাজ করা; বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন ও গবেষণা করা, ছাত্রছাত্রীদেরকে গবেষণায় শরিক করা; এবং নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কমিউনিটি সার্ভিস দেওয়া। শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় সামাজিক সুশিক্ষা বিস্তারেও যথেষ্ঠ অবদান রাখবেন (বাস্তবে এখন চলছে উল্টোটা)। শিক্ষাঙ্গন সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয়। দেশব্যাপী বিদ্যমান অরাজকতা, সীমাহীন দুর্নীতি, লাগামহীন অব্যবস্থাপনা মুক্ত করে স্থিতিশীল অবস্থায় আনতে পারলে শিক্ষকদের মাধ্যমে দেশের আরো অনেক কাজও করিয়ে নেওয়া সম্ভব। ছোটবেলায় একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের রুমের সামনে টাঙানো লেখা পড়েছিলাম, 'কোনো রোগই চিকিৎসার অযোগ্য নয়, প্রয়োজন রোগীর ধৈর্য ও চিকিৎসকের প্রজ্ঞা'।

(১০ জুলাই ২০২৩, যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।